সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

ক্বালব একটি তরবারির খাপের মতো। একই খাপে দুটি তরবারি রাখা যায় না। তেমনি ক্বালবের মধ্যেও পার্থিব মোহ এবং আল্লাহ একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। ক্বালব থেকে মোহ বের করে দাও। তবেই আল্লাহ এসে সেখানে বসবেন।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

আশ্বিন ১৪২১, সেপ্টেম্বর ২০১৪, জিলক্বদ ১৪৩৫

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

আলোর জগৎ এবং প্রবেশের ছাড়পত্র

আমীন : প্রশংসা মনুষ্য সমাজের একটা বিশেষ দিক। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একে অপরের প্রশংসা করে। আপনি এই প্রশংসা সম্পর্কে গত জুমায় সাবধান করে দিয়েছেন।

গুরু : প্রথমত তোমাকে প্রশংসা এবং তোষামোদ– এর পার্থক্য বুঝতে হবে। প্রশংসা হচ্ছে কারো গুণকীর্তন করা, সাধুবাদ দেয়া, সুখ্যাতি করা। তোষামোদও কিন্তু এক ধরনের গুণকীর্তন। কিন্তু তোষামোদ বা চাটুকারিতা হচ্ছে এমন গুণকীর্তন যা ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতিতে, তাকে খুশি করার উদ্দেশে করা হয়। এ গুণকীর্তনের বিশেষ দিক হচ্ছে অতিরঞ্জন। অন্যদিকে প্রশংসা হচ্ছে গুণের যথার্থ মূল্যায়ন এবং সেটা ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ভর নয়। তবে প্রশংসা সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে করাই শ্রেয়। ব্যক্তি যেখানে উপস্থিত সেখানে তার ত্রুটিগুলোকেই বিশেষভাবে তুলে ধরা উচিত যাতে তিনি নিজেকে সংশোধন করতে পারেন। যারা আমার প্রশংসা আমার সামনে করেন তাদের কাজকে আমি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখি।

আমীন : হুজুর পাকের (সাঃ) হাতে বাইয়েত হয়েছিল বহু আরব বেদুইন। তাদের কেউ কেউ হুজুর পাককে (সাঃ) এ ধরনের প্রশংসা করতো যার পেছনে আন্তরিকতা থাকতো না।

গুরু : হ্যাঁ, এ ধরনের মোনাফেকদের সম্পর্কে কুরআনে বহুবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুল (সাঃ) এদের এই শঠতাপূর্ণ আচরণে খুবই কষ্ট পেতেন। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়া এবং আবদুর রহমান বিন মুলজিমের কথা তো তোমরা শুনেছো। এরা রাসুলের সামনে তার প্রশংসা করতো কিন্তু পেছনে গিবত করতো। এদের সম্পর্কে সুরা আহযাবের ৫৭ ও ৫৮ নং আয়াতে সাবধান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে– ইন্নাল্লাজিনা ইউজুনাল্লাহা ওয়া রাসুলাহু লা'আনাহুমুল্লাহু ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া আয়াদ্দালাহুম আজাবাম মুহিনা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং রাসুলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের ইহকাল এবং পরকালে অভিশপ্ত করেন এবং তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এখানে রাসুলের (সাঃ) মনে কষ্ট দেবার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। রাসুলের মনে কষ্ট দেয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর মনে কষ্ট দেয়া। আর এমন সব ব্যক্তি সকলেই অভিশপ্ত। আল্লাহর ক্রোধের স্পষ্ট আভাস এখানে পাই কারণ এরপরই এরশাদ হচ্ছে– ওয়াল্লাজিনা ইউজুনাল মুমেনিনা ওয়াল মুমিনাতে বিগাইরে মাকতাসাবু ফাক্বাদিহ তামালু বুহতানাও ওয়া ইসমাম মুবিনা। অর্থাৎ নিরপরাধ মুমিন পুরুষ ও নারীকে যারা কষ্ট দেয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। এখানে যে কথাটা কুরআনের আক্ষরিক অর্থ থেকে বোঝা যাবে না তা হচ্ছে আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর প্রিয়পাত্র মুমিন এবং এই মুমিনদের যাঁরা প্রিয়পাত্র তার সব মিলিয়ে আল্লাহর রহমতের একটি বলয় সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোকিত জগতের কাউকে যদি কেউ মানবিক বা শারীরিক নির্যাতন করে তবে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে আল্লাহর স্পষ্ট অভিসম্পাত। এ জন্যই ঐ ধরনের আধা মুসলমান অর্থাৎ মোনাফেকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে– তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। অর্থাৎ আল্লাহ জানতেন কালেমা পড়েও বহুলোক মুমিন হবার গৌরব অর্জন করেনি। বরং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল এবং রাসুলের সত্যিকারের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় তৎপর। এদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হচ্ছে– ইউরিদুনা লিইউতফেয়ু নুরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি [সুরা সাফ্ফ/৮] অর্থাৎ তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন।

আমীন : হুজুর, এই মোনাফেকদের তো সেকাল-একাল নেই। এরা তো এখনো আমাদের মধ্যে সক্রিয়। নামে মুসলমান– লেবাসে ধার্মিক কিন্তু কার্যত রাসুলের এত্তেবা করে না। এদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আল্লাহ যেন আমাদের রক্ষা করেন। আমরা কিভাবে এ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি?

গুরু : রাসুল পাকের শর্তহীন আনুগত্য ছাড়া কেউ আল্লাহর নূরের অধিকারী হতে পারে না। এ সঙ্গে চাই মোহাসেবা বা আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং ইলমে তাসাউফের পায়বন্দি। আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা যার নেই তার পক্ষে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত এবং মারেফত–এ সবের সমন্বিত রূপ হচ্ছে তাসাউফ। ক্বালবকে সংশোধন করতে হলে তাসাউফের কোনো বিকল্প নেই। কারণ তাসাউফ ক্বালবের বিবেচনা শক্তিকে সুদৃঢ় করে, ক্বালবের নূর প্রজ্বলিত করে এবং ক্বালবকে পবিত্র করে। এ জন্যই বলা হয়েছে– আততাসাউফো তাজকিয়াতুল ক্বালব। তাসাউফের আলোকে যার অন্তর আলোকিত হয় না তার কুরআনের শিক্ষা আক্ষরিক অর্থেই সীমাবদ্ধ। কুরআন এমন ব্যক্তির সঙ্গে কখনই কথা বলে না। রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন– কুরআনের একটি জাহের ও একটি বাতেন আছে। এই বাতেনেরও একটি বাতেন আছে– এই শেষোক্ত বাতেনেরও আবার সাতটি বাতেন আছে (বোখারি)। রাসুলের খাস মহব্বত ছাড়া কুরআনের এই গূঢ়তত্ত্বের মায়াবি পর্দা কখনই দুলে উঠবে না। তোমরা কোন কুরআনের পেছনে ছুটছো জানি না। কুরআন তো মসজিদের মিহরাবে নেই, কুতুবখানায় নেই– অক্ষরে আবদ্ধ এই কুরআন তো তোমাকে পথ দেখাতে পারবে না। জিন্দা কুরআনের দামন ধরতে হবে। হুজুর পাকই (সাঃ) হচ্ছেন সেই জিন্দা কুরআন। যে বিদ্যার্থী কালো কালো অক্ষরের মধ্যে কুরআনকে সন্ধান করে তার জন্য অনুকম্পা হয়।

আমীন : হুজুর, রাসুলে পাক (সাঃ) তো আমাদের মধ্যে সশরীরে বর্তমান নেই। আমরা এমনই হতভাগ্য যে তার দামন ধরার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি।

গুরু : এ জন্যই অন্য একটি হাদিসে তোমার আমার মতো হতভাগ্যের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। রাসুলে পাক (সাঃ) বলেছেন– আমার উম্মতদের মধ্যে যাঁরা নিজের জামানার ইমাম অর্থাৎ যাঁকে আমি সেই জামানার পথপ্রদর্শক করেছি, তাঁকে খুঁজে না নেয় তাদের মৃত্যু হবে জেহালতের। জামানার সেই ইমামকে তোমাদের সন্ধান করে নিতে হবে। তাঁর হাতে হাত রাখলেই আল্লাহর হাতে হাত রাখা হয়। এদের সম্পর্কেই কুরআনে বলা হচ্ছে– আল্লাহু ওলিইউল্লাজিনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূর [সুরা বাকারা/২৫৭]। অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছেন ইমানদারদের বন্ধু এবং তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, ওয়াল্লাজিনা কাফারু আউলিয়া-হুমুত্তাগুতু ইউখরিজুনাহুম মিনান নূরি ইলাজ জুলুমা-ত। অর্থাৎ যারা কুফরি করে অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বন্ধু হচ্ছে সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীর দল এবং তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর নূরের একটা বিশেষ বলয় আছে। সে বলয়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্র মিলবে তাঁর কাছে যিনি আমাদের ভালোবেসে আমাদের আলোর পথে ডাক দিয়েছেন। এ আলো আমাদের সকলের অন্তরকে উদ্ভাসিত করুক। আমিন।

বিশ্বনবী (সা.)-এর দেখানো সৌভাগ্যের সিঁড়ি

(চতুর্থ পর্ব)

বিশ্বনবী (সাঃ) আরো বলছিলেন, 'বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ হলো লজ্জা। আর লজ্জা থেকে উৎসারিত হয়: নমনীয়তা, দয়াশীলতা, প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহর পাহারার প্রতি মনোযোগ, (দৈহিক ও মানসিক) সুস্থতা মন্দ থেকে দূরে থাকা, সমৃদ্ধি, দানশীলতা, বিজয় এবং মানুষের মাঝে সুনামের সঙ্গে স্মরণ। এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি তার লজ্জা থেকে অর্জন করে। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নসিহত গ্রহণ করে এবং তাঁর অপমানকে ভয় করে।' আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে উৎসারিত হয়:

১. দয়া
২. পরিণামদর্শিতা
৩. আমানত রক্ষা
৪. খেয়ানত বর্জন
৫. সত্যবাদিতা
৬. লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা
৭. সম্পদের পরিশুদ্ধি
৮. শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি
৯. অসঙ্গত কাজ করতে নিষেধ করা এবং
১০. বোকামি বর্জন।

বিবেকবানরা এসব বিষয় ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে পেয়ে থাকেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্তের অধিকারী হয় এবং যার মধ্যে লঘুচিত্ততা আর মূর্খতা থাকে না এবং যে ক্ষমাশীল হয় ও মার্জনা করে।

বিশ্বনবী (সাঃ) আরো বলছিলেন, আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ অব্যাহতভাবে সৎ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে লাভ হয় :

১. অশালীন কথাবার্তা বর্জন,
২. মনের উৎকণ্ঠা থেকে দূরে থাকা,
৩. সতর্কতা অবলম্বন
৪. ইয়াকিন তথা অবিচল বিশ্বাস,
৫. মুক্তি-প্রিয়তা,
৬. আল্লাহর আনুগত্য,
৭. কুরআনের প্রতি সম্মান,
৮. শয়তান থেকে দূরে সরে যাওয়া,
৯. ন্যায়কে মেনে নেয়া এবং
১০. হক ও ন্যায্য কথা।

এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি ভালো কাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সৎ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে লাভ করে থাকে। ধন্য সেই ব্যক্তি যে নিজ ভবিষ্যতের চিন্তায় এবং নিজ পরকালের চিন্তায় থাকে। আর দুনিয়ার ধ্বংস থেকে শিক্ষা নেয়। আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ মন্দকে ঘৃণা করা থেকে লাভ হয় :

১. ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা
২. সহিষ্ণুতা
৩. উপকার করা
৪. পরিকল্পনার ওপর স্থির থাকা
৫. সঠিক পথকে আগলে রাখা
৬. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
৭. প্রাচুর্য
৮. নিষ্ঠা
৯. সব অনর্থক কাজ বর্জন এবং
১০. যা কিছু তার জন্য উপকারী তা বজায় রাখা। এগুলো বিবেকবানেরা মন্দকে ঘৃণার মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর হক পথে পদক্ষেপ নেয়, আর তাঁর পথেই চলে।

বিশ্বনবী (সাঃ) শামউনের প্রশ্নের জবাবে আরো বলছিলেন– বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম কল্যাণ হিসেবে উপদেশদাতার অনুসরণ থেকে লাভ হয় :

১. বুদ্ধির বিকাশ
২. আত্মিক পূর্ণতা সাধন
৩. ভালো পরিণাম
৪. ভর্ৎসনার হাত থেকে মুক্তি
৫. গ্রহণীয় হওয়া
৬. বন্ধুত্ব
৭. অন্তরের প্রসারতা
৮. ন্যায়বিচার বা ইনসাফ
৯. কাজে-কর্মে উন্নতি এবং
১০. আল্লাহর আনুগত্যের শক্তি সঞ্চার।

ধন্য সেই ব্যক্তি যে নফসের দ্বারা পরাস্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। এগুলো হলো সেই বৈশিষ্ট্য যা আকল থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

এ পর্যায়ে শামউন বিশ্বনবী (সাঃ)-কে বলেন : মূর্খদের চিহ্নগুলো আমাকে বলুন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যদি তার সঙ্গে তথা মূর্খের সঙ্গে মেলামেশা করো, সে তোমাকে কষ্ট দেবে। যদি তার থেকে দূরে সরে যাও, তোমার বদনাম করবে। যদি তোমাকে দান করে, তাহলে তোমার ওপর করুণার গর্ব করবে। আর তুমি যদি তাকে দান করো, তা হলে অকৃতজ্ঞ হবে। যদি কোনো গোপন কথা তার সঙ্গে বলো, সে খেয়ানত করবে। আর তোমাকে যদি কোনো গোপন কথা সোপর্দ করে, তা হলে তোমার প্রতি অভিযোগ করবে। মূর্খ যদি ক্ষমতাবান হয়, তা হলে অরাজকতা করে এবং রূঢ় ও নিষ্ঠুর হয়। যদি নিঃস্ব হয়, তা হলে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে। যদি আনন্দিত হয় তা হলে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং অবাধ্য হয়, আর যদি দুঃখিত হয়, তা হলে নিরাশ হয়ে পড়ে। মূর্খ যদি হাসে তা হলে অট্টহাসি দেয়, আর যদি কাঁদে, তা হলে পশুর মতো গর্জন করে। মূর্খ ব্যক্তি সৎলোকদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আল্লাহকে ভালোবাসে না এবং তাঁকে মান্য করে না। তাঁর থেকে লজ্জা করে না এবং তাঁকে স্মরণ করে না। তুমি যদি তাকে খুশি করো, তা হলে তোমার এমন গুণের প্রশংসা করবে যা তোমার মধ্যে নেই। আর যদি তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়, তা হলে তোমার প্রশংসাকে বিনষ্ট করে। আর মিথ্যা প্রচারে তোমার বদনাম ছড়ায়। এগুলো মূর্খদের পন্থা।

এরপর পাদ্রি শামউন রাসুল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, ইসলামের নিদর্শন কী, আমাকে বলুন।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : বিশ্বাস, জ্ঞান এবং কর্ম।

পাদ্রি শামউন প্রশ্ন করেন : ইমানের, জ্ঞানের ও কর্মের চিহ্ন কী?

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : ইমানের চিহ্ন চারটি: আল্লাহর একত্বের স্বীকারোক্তি, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস আর তাঁর রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস।

আর জ্ঞানের চিহ্ন চারটি : আল্লাহকে চেনা, তাঁর বন্ধুদের পরিচয় জানা, তাঁর ফরজগুলোকে জানা এবং সেগুলোর সংরক্ষণ করা যাতে সেসব সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়।

আর কর্মের চিহ্ন হলো নামাজ, রোজা, যাকাত এবং নিষ্ঠা তথা এবাদতকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। ■

সূত্র: আইআরআইবি

আমি কে, কী করি : আমি আত্মার প্রতিনিধি

নিজাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ যাবৎ আমার আমিত্ব এক প্রজ্ঞাময় সত্তায় সাত্ত্বিক অবস্থায় ছিল, যখন চাওয়া ও পাওয়া পূরণ হতো ঐশী শক্তিতে যথাযথভাবে দৈহিক উপাদানের আকর্ষণের মাধ্যমে। এখন দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্মক্ষেত্রও প্রসারিত। তাই দেহের অভাব পূরণের জন্য ষড়রিপুর সৃষ্টি। এই ষড়রিপুও আল্লাহতায়ালার মহাদান। এই ষড়-রিপুর কারণেই মানুষ পাপ করে এবং রাহমানুর রাহিমের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাই আল্লাহতায়ালা বলেছেন– মানবজাতি যদি পাপ না করতো, আল্লাহতায়ালা অন্য কোনো এক জাত সৃষ্টি করতেন। যারা পাপ করতো এবং আল্লাহতায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। গাফুরুর রাহিম আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করতেন এবং তাতেই তাঁর আনন্দ। এই রিপুর পবিত্র দায়িত্ব আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি আত্মার কর্মময় দেহের অভাব পূরণের জন্য উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও অনুভূতি জোগানো। এই ষড়রিপু যাতে একত্রিতভাবে এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারে তজ্জন্য মনের সৃষ্টি। মনের পবিত্র দায়িত্ব, পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) অনুভূতির যন্ত্রের সাহায্যে ষড়রিপুকে আয়ত্তে রেখে আমার এই প্রজ্ঞাময় সত্তা, আত্মার বাহন দেহকে সিরাতুল মোস্তাকিমে চালিত রাখা।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য নামক এই ষড়রিপু মানবাত্মার খাদেম। আল্লাহতায়ালার সঙ্গে আত্মার মিলনপথে এরা সবাই সীমিত অবস্থায় থেকে সহায়ক হওয়া। আত্মার স্বভাবজাত বিবেক এবং বিবেকের পরিবেশজাত প্রতিক্রিয়া বুদ্ধি, এই দুইয়ের সাহায্যে এরা মনের অধীনে থেকে আত্মার খেদমতে নিয়োজিত। অনেক সময় এই রিপু মনকে কলুষিত করে আত্মাকে পথহারা করে। তখন বিবেক ও বিবেকের সহায়ক বুদ্ধির সাহায্যে মন তাদের আয়ত্তে আনে। তাই বিবেক ও বুদ্ধি রিপুর প্রভাবে মন দ্বারা কলুষিত হলে আত্মা মহা বিপদগ্রস্ত হয়। আত্মার দেহরূপ বাহনকে সুস্থ রাখার জন্য এবং পরিবেশকে কলুষিত না করে বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে চালিত মনের অধীনে যতোটুকু কাজ করা দরকার ততোটুকুই রিপুর পবিত্র দায়িত্ব। এর ব্যতিক্রম হলেই আত্মা সিরাতুল মোস্তাকিম চ্যুত হয়ে যায়।

এই ষড়রিপুই মানবের পার্থিব সত্তা ও অস্তিত্ব। এক কথায় এটাকেই আমিত্ব বলে। এই অস্তিত্ব বা আমিত্ব নিয়ে মানবের কর্মময় জীবন আরম্ভ। এই অস্তিত্ব বা আমিত্ব যার নেই তার কর্মময় জীবন বিফল অর্থাৎ সে সম্পূর্ণভাবে অসাড় বা রোগা। আবার যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে রাখতে পারছে সে ত্যাগী। পার্থিব জীবনেই স্বর্গসুখের অধিকারী। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং ষড়রিপুরই অধীন বা আয়ত্তে, সে সীমালঙ্ঘনকারী ও পথভ্রষ্ট। পার্থিব জীবনে সে নরকবাসী। এই ষড়রিপু যে ব্যক্তির যতো আয়ত্তে বা যে যতো এই রিপুকে আপন করে নিতে পারে, তার মধ্যে ততোই আমিত্বের অবস্থান কম ও সীমিত। এই রিপুই আমিত্বের বাহক। সীমালঙ্ঘনকারী রিপু আত্মার সাত্ত্বিক অবস্থার বাধাস্বরূপ, যা আত্মাকে অশান্ত ও পথভ্রষ্ট করার একমাত্র কারণ। যার ফলে আত্মা তার প্রশান্ত প্রকৃত অবস্থা বা স্বরূপকে দেখতে অক্ষম। এরা সব সময় আত্মাকে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট করে অশান্ত ও চঞ্চল রাখে। যেমন সূর্যের ছবি বা আকার এক পাত্র শান্ত পানিতে সঠিক দেখা যায়, আর অশান্ত পানিতে বিকৃত দেখা যায়। তদ্রূপ এই রিপুকেই আপন করে নিয়ে আত্মা যখন সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, রিপুর আর পার্থিব কোনো কিছু চাওয়া-পাওয়ার দরুন আকর্ষণ বা বিকর্ষণজনিত অস্থিরতা কিছুই থাকে না, তখনই রিপু পরিতৃপ্ত হয়। আত্মা প্রশান্ত হয়। আত্মা তার সাত্ত্বিক অবস্থায় স্বরূপকে উপলব্ধি করে বা চেনে। সে কী বা কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় সে যাবে। সৃষ্টির রহস্য বুঝতে পারে। যে প্রজ্ঞাময় সত্তা থেকে আসছে এবং যেখানে ফিরে যাবে তাঁকে চিনতে পারে। যাকে বলে– 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।' অর্থাৎ যে নিজকে চিনতে পারছে সে তার প্রতিপালককেও চিনতে পারছে। এটাও চিরসত্য, যে প্রজ্ঞাময় মহান সত্তা থেকে এই আত্মার যে সাত্ত্বিক অবস্থার আগমন, পার্থিব কর্মময় জীবনের পর সেই স্বচ্ছ সাত্ত্বিক ও নিষ্কলুষ অবস্থায় সেই মহান প্রজ্ঞাময় সত্তায় ফেরাই আত্মার সফল সফর বা ভ্রমণ, যাকে বলে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন', অর্থাৎ যে সত্তা বা যার জন্য আসা নিশ্চয়ই সেই সত্তায় ফিরতে হবে।

তাই যেহেতু রিপু আল্লাহতায়ালার এক মহান দান, তাদের উপেক্ষা করাও উচিত নয়। তাদের পার্থিব সুখভোগ একেবারে অগ্রাহ্য করলেও আল্লাহতায়ালার মহান দানকে অগ্রাহ্য করা হয়। এই জন্য ভোগ না করলে ত্যাগ হয় না। তাই যৌবনে সীমিত ভোগ, বার্ধক্যে সম্পূর্ণ ত্যাগ। কারণ তাদের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিকার্য চলছে। মানবাত্মা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদ গ্রহণ করে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিকে উপলব্ধি ও উপভোগ করে আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া ও প্রশংসা করে। এই শুকরিয়া ও প্রশংসাই বান্দার খাস এবাদত, যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

এই রিপুর অস্তিত্বের কারণেই পার্থিব সুখভোগ, লোভ-লালসা, কামনা ও বাসনার অনুভূতি। প্রতিটি অনুভূতিতেই রিপুর স্বার্থ জড়িত। তাই এই স্বার্থ জড়িত অনুভূতিতে সামান্য ও ক্ষণিক শান্তি। কারণ এই অনুভূতিতে রিপুবিশেষের চারিত্রিক পার্থিব স্বার্থ জড়িত থাকে। রিপুর এই চারিত্রিক স্বার্থের জন্যই মানব একে অন্যের উন্নতি বা অবনতিতে সন্তোষ বা অসন্তোষ বোধ করে। একই কারণে সবার সঙ্গে সবার সমান মিল-মহব্বত হয় না। যে রিপু যার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সে সেই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরই সাহচর্য চায়। তাই চোরে চোরে দুস্তি, আর সাউধে সাউধে দুস্তি হয়। তাতেই সে শান্তি পায়। সে সাহচর্য অতি উচ্চ স্তরের বা পবিত্রও হতে পারে। অতি জঘন্যতম বা অপবিত্রও হতে পারে। এই সাহচর্য যতোই উচ্চ স্তরের বা পবিত্র হবে, তাতে সে স্বর্গসুখ পাবে, আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভ করবে, আর যতোই অপবিত্র বা জঘন্যতম হবে, যদিও তা ক্ষণিকের জন্য পার্থিব সুখময় কিন্তু আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ থেকে বিমুখগামী হবে। (চলবে)

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা

কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামী

‘বায়াত’ প্রসঙ্গে আলোচনা– এই লেখাটি কাজী বেনজীর হক চিশতী নিজামীর ‘বেহুঁশের চৈতন্য দান’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যারা আল্লাহকে সন্ধান করে আল্লাহ তাদের মধ্যেই একাকার হয়ে আছেন যেখানে সে থাকুক না কেন। তাই আল্লাহপাক বলেছেন– ‘ওয়াহুয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম।’ অর্থাৎ তুমি যেখানে তিনিও (আল্লাহ) সেখানেই আছেন (সুরা হাদিদ)। হযরত রাসুল (সাঃ) বলেছেন– ‘আর ফাকরু ফাকরি ওয়াল ফাকরু মিনহি’ অর্থাৎ আমি সন্ধানী ভিতর এবং সন্ধানী আমার ভিতর। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর বান্দার মধ্যে ‘রব’ রূপে মূর্তিমান হয়ে ওঠেন এবং বান্দার সুরত আল্লাহর সুরত দর্শনের আয়না স্বরূপ হয়ে যায়। যেমন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন– ‘আল মুমিনিনা মিররাতুল্লাহ’ অর্থাৎ মুমিনরা হলেন আল্লাহর আয়না (মেশকাত শরিফ)। আল্লাহ প্রকাশ্যেই আছেন এ কথা সুরা হাদিদের ৩ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন– ‘হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু ওয়ায জাহেরু ওয়াল বাতেনু; ওয়াহুঅ বিকুল্লি শাইয়িন আলিম’ অর্থাৎ তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি জাহের, এবং তিনি বাতেন; এবং প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানবান। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– ‘কুন্তু কানজান মুখফিয়ান ফাআবাবতু আন ইউরেফা ফা খালাকতু খালকা’ অর্থাৎ আমি গোপন ভাণ্ডার স্বরূপ গোপন ছিলাম নিজেকে পরিচিত করার মানসে সৃষ্টির সৃজন করে প্রকাশিত হলাম। সুরা বাকারার ১১৫ নং আয়াতে আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, সবদিকেই তাঁর চেহারা রয়েছে। যেমন, ‘ওয়া লিল্লাহিল মাশরেকু ওয়াল মাগরেবু। ফা আইনা মা তুওয়াললু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহে’ অর্থাৎ এবং পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা যেদিকেই ফেরো না কেন, সুতরাং সেদিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে।

জাহেরেতে আছে দেখ মাশুকের জাত
কুল্লে আলমে দেখ সব তাহারই সুরাত।
ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ দেখ কোরানে বলে
তাঁর ভেদবাত পাবে তুমি মুর্শিদকে পুছিলে।
আলমে ফানাতে যতো সুরাত তাঁর আছে
সকলই ফানা হয়ে যাবে সেই জাতেতে মিশে।
কি যাবে কি রবে তাহার ভেদ জানা চাই
ফানা কি বাকা কি তাহার ভেদ বুঝ নাই।
আলমে বাকাতে আছে বাকারই অজুদ
গঞ্জেমুখফিতে আছে জান হামেশা মৌজুদ।
বাকার অজুদ বিনে জান সবই ফানা হবে
কুল্লুমান আলাইহা ফা-নি ভেদ বুঝে নিবে।
বাকার অজুদ জান আছে রবের সুরাত
ওয়াজহু রাব্বেকা দেখ কোরানে বরাত।
জালাল জামালের ভেদ তুমি যবে পাইবে
জামালি সুরাত তবে তুমি সদা দেখিবে।
রবের সুরাত জান আছে নূরময় অজুদ
জুল জালাল ওয়াল ইকরাম কোরানে সাবুত।

কুল আলমে আল্লাহর যে সুরত রয়েছে আহাদ রূপে, সেই আহাদ তত্ত্বই হলো মানুষ তত্ত্ব, যেখানে রবের সুরত বিকশিত হয়ে ওঠে রুহ নাজিল হলে বা জাগ্রত হলে। রবের সুরত দেখে ধ্যান করাই হলো জাতের জিকির। কুরআনে সুরা বাকারার ১৫২ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন– ‘ফাসকুরুনি আজকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন’ অর্থাৎ সুতরাং আমার জিকির (স্মরণ বা ধ্যান) করো, আমি তোমাদের জিকির করবো। এবং আমার জন্য শোকর (কৃতজ্ঞ হও) করো এবং তোমরা কুফরি করো না। এ জাতের জিকিরের চেয়ে উঁচু স্তরের কোনো বন্দেগি বা এবাদত নেই। আর খাজা বাবা গরিবে নেওয়াজ (রহঃ) তাঁর ‘দেওয়ানে’ বলেছেন– ‘খাওয়াহিকে রাখম বানিদার বেহারা মান বানগরমান আয়না ওয়েম ও সিত খোদা আজ মান’ অর্থাৎ যদি তুমি খোদার মুখ দেখতে চাও তাহলে আমার চেহারার দিকে তাকাও। আমি তাঁর আয়না, সে আমি থেকে আলাদা নয়। যারা নিজ ‘আমিত্বকে’ শূন্য করে ফেলেছে তারাই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে গেছে, তারা বহু হয়েও এক, একক এবং অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়ে গেছে। তাই যে মুরিদ নিজ মুর্শিদের প্রতি আদব, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং অনুসরণ করলো তবে সে সমস্ত নবী-রাসুল, পীর-আউলিয়ার প্রতিই আদব, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করলো। আর যে মুরিদ নিজ মুর্শিদের বেলায়েতের প্রতি সন্দেহ করলো বা বেআদবি করলো এবং বেআদবির কারণে নিজ থেকেই বা মুর্শিদই তাকে তরিকা থেকে খারিজ করে দিলেন সে তখন ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে গেলো। (চলবে)

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ) স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

এ গ্রন্থে রয়েছে হুজুর জৌনপুরির (রহঃ) নিজের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত প্রায় সমস্ত রচনা এবং প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখাসহ হুজুরের দুর্লভ ছবিসহ অ্যালবাম। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা, সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ।

পনের শ’ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ১,৫০০ টাকা। আগ্রহী পাঠক ও ভক্তবৃন্দের জন্য রয়েছে ২০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা। আপনি সংগ্রহ করুন এ মহামূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। আপনার সংগ্রহে রাখা এ গ্রন্থটিই হবে সুন্দর ও সত্য পথে চলার পাথেয়।

প্রাপ্তিস্থান : **পাঠক সমাবেশ**, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন (মোবাইল) : ০১৮১৯২১৯০৮১।

ডা. হাবিবুর রহমান - মোবাইল : ০১৯১৩৮২০৭৫৬

আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১, বাইতুর রহিম জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, পূর্ব মনিপুর (নুরানি পাড়া), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।